ইভ টিজিং প্রসঙ্গে (২য় বা শেষাংশ)
বিপ্লব মুখোপাধ্যায়

কম্পিউটারের প্রভাব

কম্পিউটার এখন এদেশে নবপ্রজন্মের একান্ত সাথী । কম্পিউটারের ভালো দিক যেমন আছে, মন্দ দিকও রয়েছে প্রচুর - এবং সেটা দিনকে দিন প্রকট হচ্ছে । ওয়েবসাইটে চ্যাটিং, পর্ণোফিল্ম, পর্ণোগ্রাফির অজস্র সম্ভার; মাউস-এ আঙুল ছোঁয়ানোর অপেক্ষামাত্র । কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে যৌনতাকে যে কতভাবে উপভোগ করা যায় তার তালিকা দীর্ঘতর হচ্ছে । এসব কিছুর প্রভাব পড়ছে কিশোর মনে । সুস্থ যৌনতার পরিবর্তে এক ধরনের বিকৃত যৌনতার শিকার হচ্ছে তারা । অসুস্থ যৌন মানসিকতার উৎপত্তি ঘটছে, প্রকাশিত হচ্ছে আচরণগত অস্বাভাবিকতা । ইভটিজিং এমনই এক ধরণের অস্বাভাবিক যৌন আচরণ ।

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী

নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী, আরো স্পষ্ট করে বললে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি মনোভাব কিন্তু আদৌ সুস্থ রুচিসম্মত এবং শোভন নয় । পুরুষের শাসিত সমাজে নারী নিতান্তই তার দেহসত্তার মধ্যে আবদ্ধ; অর্থাৎ নারী এক দেহসর্বস্ব, যৌনতাসর্বস্ব এক যৌনবস্তু মাত্র -- এটাই নারী সম্বন্ধে সাধারণ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী । 'মানুষ' হিসেবে নারীর সামাজিক মর্যাদা একান্তভাবেই গৌন, হয়তো বা অবান্তর । নারীর মুখ্য পরিচয় সে ভোগের বস্তু । নারী ভোগ্য, নারী পণ্য । অথচ নারীর যে নিজস্ব আত্মিক ও মানসিক সত্তা আছে, ব্যক্তিগত রুচি-পছন্দ-আবেগ-অনুভূতি আছে এবং মানুষ হিসেবে তা প্রকাশ করার পূর্ণ অধিকার আছে, এ সত্য মেনে নিতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তথা অধিকাংশ পুরুষ কুণ্ঠিত । বিভিন্ন সংস্কার ও বিধিনিষেধের নামে নারীকে শৃঙ্খলিত করার আয়োজন হয়েছে । ইতিহাস এমন সাক্ষ্যই দেয় । সময়ের অতিবাহনে এই শৃঙ্খলের চিত্র একটু ফিকে হয়েছে মাত্র, তার বেশি কিছু নয় । নারী এভাবেই পুরুষের চোখে স্রেফ যৌনভোগের বস্তু হিসেবে পরোক্ষে সমাজস্বীকৃত হয়ে যায় । তাই মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য যখন কলেজ ছাত্রীদের ধর্ষণ এড়ানোর জন্য উপযুক্ত মাত্রায় বেশবাস পরিধান করার পরামর্শ দেন কিংবা মহারাষ্ট্রে শিবসেনা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলে স্বল্পবাস ধারণ করলে ধর্ষিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকাই বাঞ্ছনীয়, তখন বিস্মিত হওয়ার মতো কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকে না । এই ঘোষণার মাধ্যমে একথাই স্পষ্ট করে দেওয়া হয় যে, স্বল্পবাস নারী পুরুষের 'কাম' রিপুকে উজ্জীবিত করবেই এবং তার ফলে ধর্ষণ নামক ঘৃণ্য ঘটনা ঘটতেই পারে । অর্থাৎ পুরুষের কাম প্রবৃত্তিকে বশে রাখার দায় নারীর, পুরুষের এ ব্যাপারে কোনো দায় নেই ।

অস্বীকারের কোনো উপায় নেই যে, এখন সমাজে বহু নারী অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছে, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে । কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা, যে স্বাধীনতা সমাজে একজন পুরুষ ভোগ করে থাকে, তা ক'জন নারী পেয়েছে ? একজন উচ্চশিক্ষিত উচ্চপদে কর্মরত তথাকথিত সংস্কৃতিবান পুরুষ যখন গর্বিত ভঙ্গীতে অন্যদের সামনে উচ্চকণ্ঠে বলেন - ''আমি আমার স্ত্রীকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছি, তার কোনো ব্যাপারে নাক গলাই না'', তখন অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝতে অসুবিধা হয় না । কান পাতলেই অস্পষ্টভাবে শোনা যায় - ''স্ত্রীকে স্বাধীনতা দেওয়া আমার এক ধরনের উদারতা । ইচ্ছে করলেই আমি তার এ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারি, স্বামী হিসেবে আমার সে অধিকার আছে ।'' এটাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের হেজিমনি বা প্রতাপ । পুরুষ নারীকে স্বাধীনতা দেয়, নারী পুরুষ-প্রদত্ত সেই

স্বাধীনতা ভোগ করে, করে খুশি থাকে । এ স্বাধীনতা যে খন্ডিত, অনুগ্রিহিত, সে বোধ থাকে না ।

এই মনোবৃত্তির প্রেক্ষিতে এভটিজিং-এর বিষয়টি দেখতে হবে । সমাজ যদি এই মনোভাবে অংশত হলেও সমর্থন জোগায় তাহলে শুধু ইভটিজিং কেন, নারীর প্রতি সংঘটিত যে কোনো ধরনের যৌন অপরাধই এক রকম বৈধতা পেয়ে যায় ।

মেয়েদের দিক থেকে

একটি মেয়ে, নারীর প্রতি পুরুষের মনোভাব ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর নির্মম সাক্ষী হয়ে, ধীরে ধীরে ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠে, নারীতে পরিণত হয় । পুরুষশাসিত সমাজ তাকে ভাবতে এবং মানতে বাধ্য করেছে যে সে দেহসর্বস্ব এক যৌনবস্তু । তার নিজস্ব স্বাধীন সত্তা বলে কিছু নেই । উচ্চশিক্ষিতা, কর্মরতা, উপার্জনশীলা নারীরাও এরূপ ভাবনাতেই অভ্যস্ত হয়ে যান ।

এ কারণেই বেশ কিছু মেয়ে ইভটিজিং-কে উপভোগ করে । এর মাধ্যমে তারা এক ধরনের তৃপ্তি লাভ করে, অর্থাৎ সে পুরুষদের আকৃষ্ট করতে পারছে । যেন, তার সৌন্দর্য, দৈহিক গড়ন, যৌন আবেদন ইত্যাদির প্রতি এ এক স্বীকৃতি । এমনকি, কোনো মেয়ে যদি তার দৈহিক সৌন্দর্য তথা যৌনতার ঘাটতি হেতু ছেলেদের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হয়ে টিজিং-এর শিকার না হয়, তাহলে সে এক ধরনের হীনমন্যতায় ভুগতেও পারে । একথা প্রযোজ্য বহু গৃহবধূ, সন্তানের মা, মধ্যবয়সী নারী সম্বন্ধেও। কিছু মেয়ের স্বল্প পোষাক এবং উদ্ভট সাজসজ্জার পেছনেও এই কারণটাই কাজ করে । যেন পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণেই তার অস্তিত্বের সার্থকতা । এথেকে পুরুষ তথা সমাজের তরফে 'মেয়েদের প্ররোচনা'-র আপাত বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যাও মিলে যায় ।

সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন ওঠে সমস্ত নারীই কি এই সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর অসহায় শিকার ? উত্তর অবশ্যই 'না'। অভ্যস্ত ছকের বাইরে হাঁটার সাহস দেখিয়েছেন এবং দেখাচ্ছেন বেশ কিছু নারী । প্রতিকূলতা, বাধা, অগ্রাহ্য করেই তারা এগোনোর চেষ্টা করছেন । এমন নারীদের সংখ্যা হয়তো বেশি নয়, কিন্তু সচেতনতা বাড়ছে, প্রশ্ন এবং প্রতিরোধ জাগছে মেয়েদের মনে । দেশে-বিদেশে বিভিন্ন নারীবাদী আন্দোলনের প্রভাব পড়ছে এখানকার মেয়েদের ওপর । ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে নারীর প্রতি মনোভাব । নারীকে মানুষ হিসেবে ভাবার, তার মনুষ্যত্বকে সম্মান দেওয়ার চেতনা বাড়ছে পুরুষ-মনে । তবু বৃহত্তর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী এখনো বড় বাধা হয়ে আছে সমাজে ।

গঠনমূলক কর্মকান্ড

যত দিন যাচ্ছে কর্মহীন বেকার যুবকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে । বিপুল সংখ্যক তরতাজা প্রাণ, উদ্দীপনায় ভরপুর, কিন্তু কর্মহীনতার দুৎসহ অভিশাপে অভিশপ্ত । এদের শক্তি-সামর্থ্য-যোগ্যতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ নেই । কর্মশক্তি যদি তার স্বাভাবিক পথে প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ না পায় তখন তা বিকৃত পথে প্রকাশিত হয়ে থাকে । ঠিক এ কারণেই বহু তরুণ-যুবক বিপথগামী হয়ে অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে । রোজ সংবাদপত্রের পাতায় চোখ বোলালেই এর অজস্র প্রমাণ মিলবে । বিকৃত পথে কর্মোদ্দীপনা প্রকাশিত হওয়ার অন্যতম উপায় হল ইভটিজিং । কাজকর্ম কিছু নেই, সারাদিন রোয়াকে, পার্কে, কিংবা চায়ের দোকানে বসে থাকা কাজ; 'মেয়ে দেখা ' ছাড়া আর কী-ই বা করার আছে ! অথচ এই প্রাচুর্যময় মানবসম্পদকে যদি সৃষ্টিশীল কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব হয় তাহলে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র সৃষ্টি হয় । বিভিন্ন অ-সরকারি সংস্থা, আংশিকভাবে হলেও, এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে । ভালো লাগার

মত যে কোনো কাজে এই কিশোর-যুবকদের যুক্ত করতে পারলে ইভটিজিং অনেকটাই কমে । সরকারি কাজ-কারবারের হাল আমরা সবাই দেখছি; তাই মনে হয় বেসরকারি সংস্থাগুলির সদর্থক ভূমিকার ওপর এর সার্থকতা অনেকটাই নির্ভর করছে ।

জীবন দর্শন - মূল্যবোধ - নৈতিকতা

যে ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে একালের শিক্ষার্থীরা, যে ধরনের পারিবারিক-সামাজিক বাতাবরণে তারা বেড়ে উঠছে, যে ধরনের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে তাদের মনোজগতের পুষ্টি হচ্ছে, তা যথার্থ মানুষ হওয়ার পক্ষে আদৌ অনুকূল নয় । আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থসর্বস্ব, ভোগবাদী মানসিকতায় আকীর্ণ, পণ্যলোভী অসুস্থ মনোবৃত্তি-সম্পন্ন একালের অধিকাংশ কিশোর তরুণ । এ এক অদ্ভুত সময় । অজস্র মুখের মিছিল কিন্তু কারুর সময় নেই অন্যের দিকে তাকানোর, অন্যের কথা ভাবার । নিজের পছন্দের বস্তুকে চাই যে কোনো মূল্যে । অন্যদের ভাবনা, তাদের রুচি-পছন্দ-ভালোলাগাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর বা মূল্য দেওয়ার প্রশ্ন অবান্তর । 'আমার ভালো লেগেছে, আমার পছন্দ হয়েছে, ব্যস্ এটাই শেষ কথা । ওটা আমার চাই ।'. . .

এই হল জীবনদর্শন -- একালের অধিকাংশ কিশোর-তরুণের । এই জীবনদর্শনের আলোকে যে-সমস্ত ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যার একটি উদাহরণ ইভটিজিং, তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তিত আজকের সমাজবিজ্ঞানীরা ।